কোনদিনতো এমনটি হয়নি। আজ চোখের জ্বালাটা বেশী হচ্ছে। চোখ দু'টো ধুতে হবে। সামনে এগিয়ে যায় সে।

অবিশ্বাস্য! অন্ধের চোখ খুলে গেছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু সে দেখতে পাচ্ছে। ঐতো সামনে বড় একটি মন্দির - মনে হয় যেরুসালেমের সেই মন্দির। এ-কি করে সম্ভব, স্বপ্ন দেখছি নাতো! নিজের শরীরে চিমটি কাটলো অন্ধ। না সব ঠিক আছে। চোখ ভাল হয়ে গেল। হাতে রাখা হাতুড়ীটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। চোখ দু'টি দু'হাত দিয়ে কচলাতে লাগল। একি! ক্রুশবিদ্ধ লোকটার রক্ত আমার চোখে প্রবেশ করতে আমার জন্মান্ধতা ঘুচে গেল। এবার সে দৌড়াতে লাগল। ততোক্ষণে কালভেরী চূড়ায় যীশুর ক্রুশ খাড়া করে দিয়েছে রোমান সৈন্যরা। তাকিয়ে রয়েছে নিষ্ফলভাবে। তখনো মাথায় কাঁটার মুকুট ও হাতে-পায়ে পেরেকের ছিদ্র দিয়ে রক্ত বয়ে চলেছে। আস্তে আস্তে হেঁটে চলে ক্রুশকাষ্ঠের পানে। নতজানু হয়ে প্রণিপাত করে সে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রাজাধিরাজ যীশুকে। অনুতপ্ত চিত্তে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে একি করলাম আমি! একজন নির্দোষ মহামানবকে আমি ক্রুশে বিদ্ধ করেছি! তিনি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত সেই মুক্তিদাতা যাকে আমি নিজ হাতে পেরেক মেরেছি। নিজেকে সামলাতে না পেরে ক্রুশটাকে নাড়তে লাগল। রোমান সৈন্যরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল কালভেরী পর্বতের বাইরে। উত্তেজিত জনতা হাততালি দিয়ে বলতে লাগল, বেটা পাগল হয়ে গেছে।

দূর থেকে তাকিয়ে রয়েছে অন্ধ লোকটি। মাত্র ত্রিশ টাকার বিনিময়ে সে এ জঘন্য কাজটা করতে পারল। নিজের উপর রাগটা ঝারতে লাগল। পাগলের মত প্রলাপ করতে করতে দৌড়াতে লাগল তার নিজগ্রাম সিরেনে। কাউকে সামনে এগুতে দিচ্ছে না রোমান সৈন্যরা। মারীয়া দূর থেকে কেঁদে চলেছেন। সান্ত্বনা দিচ্ছেন যীশুর প্রিয় শিষ্য যোহন।

সৃষ্টির প্রথম মানব আদম আর হবা নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো আর দ্বিতীয় আদম ক্রুশকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিয়ে মানবজাতির পরিত্রাণের পথ খুলে দিলেন। মানব জাতি পেল মুক্তি - পেল স্বর্গে যাবার নতুন দিগন্ত। আদি পাপের হল পতন।

এক মুক্তিযোদ্ধার গল্প

ডমিনিক কোড়াইয়া

আগামীকাল দীপুর বিয়ে। আজ গায়ে হলুদ। তাই বাড়িটা সাজানো হয়েছে আধুনিক সজ্জায়। বাড়ির চারিদিকে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। বাড়িতে ও সকাল থেকে বিভিন্ন মানুষের আনাগোনা। আত্মীয়-স্বজনরা আসছে। সকল আত্মীয়-স্বজনরা অনেকদিন পর একত্রিত হওয়ার আনন্দে মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে তুলল।

দীপুর মনটা যেন উদাস হয়ে আছে। সে আগামীকাল একজন জীবন সঙ্গিনী পেতে যাচ্ছে ভাবলেই যেন গা শির শির করে। পাশের গ্রামের মেয়ে চাঁদনীর সাথে বিয়ে হচ্ছে অপুর। সূর্যটা যখন পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ছে, যখন প্রকৃতিতে নেমে আসছে সন্ধ্যা তখন শুরু হল দীপুর গায়ে হলুদ পড়ানো। চাঁদনীকে আগেই পাত্র পক্ষ হলুদ পড়িয়ে এসেছে। দীপুর হলুদ অনুষ্ঠান শেষ হতে একটু দেরী হয়েছিল কিন্তু সবকিছু সুন্দর হয়েছে। শত ক্লান্তির মাঝেও কারও চোখে ঘুম নেই। সবাই দল বেঁধে গল্পে মাতোয়ারা। পরদিন যথারীতি মহা আড়ম্বরের সাথে তাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হল।

আজ ৭ই মার্চ। দীপু ও চাঁদনীর নতুনজীবনের দেড়মাস চলল। দু'জন দু'জনকে প্রচুর ভালবাসে। বিকালে দীপু তার প্রিয় রেডিওটি চালু করে বসল, তখনই রেডিওতে প্রচার হল বঙ্গবন্ধুর সেই জ্বালাময়ী ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি আরো দিব তবুও এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ।' এই ভাষণ শোনার সাথে সাথে দীপুর মনে দেশপ্রেম জাগরিত হয়ে উঠে অগ্নিশিখার ন্যায়। দেহের অস্থিসকল অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে যদি যুদ্ধ হয় তাহলে যুদ্ধে অংশ নিবে।

২৫ শে মার্চ। রাত্রিবেলা। পাক বাহিনী ঘুমন্ত বাঙালীর উপর চালাতে শুরু করল রাইফেল, নির্যাতন। যাকে পাচ্ছে তাকে গুলি করছে। এমনকি নিষ্পাপ শিশুরাও বাদ যায়নি এ নির্যাতন থেকে। বাঙালী জাতি যখন দেখ অত্যাচার কমছে না তখনই তাঁরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল হানাদার বাহিনী উপর।

দীপু টগবগে যুবক। জীবনের মায়া তুচ্ছ করে সে সিদ্ধান্ত নেয় যুদ্ধে যাবে। কিন্তু তার পিতা-মাতা ও নববধূটি তাকে বাঁধা দেয়। পিতা-মাতার কথা তো দূরে, প্রাণের প্রিয়তমার কথাও সে শুনল না, মানল না। তার এক কথা সে যুদ্ধে যাবে। অনেক কষ্টে দীপু নববধূটিকে রাজী করাল। অবশেষে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে আরো কয়েকজন সহ দীপু পাড়ি দেয় ভারতে। ওখান থেকে এক মাসের ট্রেনিং শেষ করে ফিরে আসে বাংলাদেশে। দীপুরা যুদ্ধ শুরু করে হানাদার বাহিনী উপর। নিজ জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছে অথচ একটু সময় পেলেই দীপুর মনে পড়ে যায় নববধূ চাঁদনীর কথা। চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠে চাঁদনীর মুখখানা। এদিকে দীপুর পিতা-মাতাও আশঙ্কার সাথে দিন কাটায়। দীপুর প্রিয়তমা স্ত্রীও দীপুর কথা চিন্তা করতে করতে শুকিয়ে যাচ্ছে, সেই হাসি খানা মুখটি, সেই চঞ্চলতা এখন আর নেই।

দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধ করে বাঙালী জাতি জয় ছিনিয়ে আনল। দীপুও যুদ্ধ শেষে বিজয়ী সৈনিকের মত নিজগ্রামে ফিরে আসে, পিতা-মাতা, নতুন বউকে কাছে পাবার আকাঙ্খায়। কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করেই বুকের মধ্যে ব্যথা অনুভব করে দীপু। গ্রামটিকে যেন বড় অচেনা লাগছে। কোন কিছু সে চিনতে পারছে না। পাক হানাদার বাহিনীরা গ্রামটিকে তছনছ করে দিয়ে গেছে। চেনারও কোন উপায় নেই। তার মনে হঠাৎ তাঁর প্রিয়তমা বধূ, পিতা-মাতার মুখ ভেসে উঠল। নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, 'কি জানি ওরা কেমন আছে?' সারা দেশে বিজয় উৎসব চলছে। আজ প্রতিটি বাঙালী আনন্দিত। দীপু বাড়িতে প্রবেশের আগেই বাড়ির অবস্থা দেখে বুঝে উঠে পাক হানাদাররা তার বাড়িতেও হামলা চালিয়েছে। দীপুর চিন্তিত মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে ওরা কি আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেছে। বাড়িতে ঘরের অবস্থা খুবই করুণ। আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখে বাড়ি একদম ফাঁকা, কেউ নেই। দীপুর মনে বৈদ্যুতিক শক লাগে।

যাদের জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে এসেছে তারা কেউ নেই। দীপু যেন এটা মানতে পারছেনা। দীপুর মনে তখন একটি কাল্পনিক দৃশ্যের উদয় হয়। পাক বাহিনী তার বধূ চাঁদনীকে জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। চাঁদনী যেতে চাচ্ছে না, শুধু কাঁদছে। হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে গেল এবং বিভিন্ন কৌশলে চাঁদনীকে অত্যাচার করছে। এই কাল্পনিক দৃশ্য দীপুর চোখে ভেসে উঠল।

[৩৫ পৃঃ দ্রঃ]